পরাশক্তির ইতিবৃত্ত

মুস্তফা হুসাইন

আদিকাল থেকেই দুনিয়ার বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলো অনুগত বা মিত্রভাবাপন্ন শাসকদের মাধ্যমে কেন্দ্রের বাইরের রাষ্ট্রগুলোতে নিজেদের ক্ষমতার বলয় ব্যাপৃত করে আসছে সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলে যে সাধারণ সমস্যাগুলো (যেমন : স্থানীয়দের প্রতিরোধ, প্রশাসনিক ব্যায়, ব্যাবস্থাপনাগত জটিলতা ইত্যাদি) হয়ে থাকে, তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে ক্ষুদ্র শক্তিগুলোর সম্পদ ও সমর্থন থেকে পরাশক্তিগুলো নিজেদের পরিপুষ্ট করে থাকে। তাই সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বা কলোনি স্থাপনের বদলে পরাশক্তির অধিক পছন্দনীয় হলো—অনুগত দালাল সরকার বা নিদেনপক্ষে 'মিত্রভাবাপন্ন' সরকার। এতে করে নামমাত্র দর-কষাকষির মাধ্যমেই পরাশক্তিগুলো নিজেদের প্রয়োজনীয় ফায়দা হাসিল করতে পারে।

ঐতিহাসিকভাবেই বিশ্বব্যাবস্থা বিভিন্ন শক্তির কেন্দ্রকে ঘিরেই আবর্তিত হলেও, পরাশক্তির দাপট চরম পর্যায়ে পৌঁছায় ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর। যখন প্রায় গোটা দুনিয়াই পূর্ব ও পশ্চিম ব্লকে বিভক্ত হয়ে যায়। একটির নের্তৃত্বে ছিল সোভিয়েত রাশিয়া ও ওয়ারশ জোট, অপরটি ছিল আমেরিকা ও ন্যাটো জোটের অধীনে। জাতীয়ভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পালাবদলের কারণে দেশীয় আন্দোলনগুলোর জন্য স্বতন্ত্রভাবে ভূমিকা রাখা সে সময়ে ছিল সবচেয়ে কঠিন। কেননা তখন শুধু স্থানীয় শাসকদের অপসারণ চাইলেই হতো না। বরং, স্থানীয় শাসকদের প্রভুর অতিকায় শক্তির মোকাবিলাও করতে হতো।

আর পরাশক্তিগুলো নিজেদের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা অধিভুক্ত দেশগুলোতে ধরে রাখতে অনিবার্যভাবেই আদর্শিক আগ্রাসন চালাতে বাধ্য হয়। যার ফলে পরাশক্তিগুলো দিনশেষে একেকটি সভ্যতার জন্মদান করে। তাই আমরা দেখি যে, প্রতিটি পরাশক্তি বা সাম্রাজ্য ও তার অনুগামী ছোট ছোট জাতিগুলো সাধারণত ঐক্যবদ্ধ হয় একটি সুনির্দিষ্ট চিন্তাকাঠামো, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বা আদর্শিক ভিত্তির আলোকে। যার ফলে তৈরি হয় নতুন সভ্যতা।

ইতিপূর্বে দুনিয়াকে যেমন- খ্রিষ্টিয় সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতা নের্তৃত্ব দিয়েছে, একইভাবে আধুনিক সময়ে পশ্চিমা লিবারেল সভ্যতা বা কমিউনিস্ট সভ্যতাকেও আধিপত্য করতে আমরা দেখেছি। প্রতিটি সভ্যতার উত্থান-পতনের গল্প আল্লাহ তা আলার এক অমোঘ নীতি মোতাবেকই সংঘটিত হয়ে আসছে।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আমেরিকান, ফরাসি, বলশেভিক বিপ্লবের পর- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন দুনিয়া চারটি আদর্শের সংঘাত দেখতে পায়- লিবারেলিজম, কমিউনিজম, ফ্যাসিজম এবং ইসলাম।

ইসলামী সভ্যতার প্রতিনিধিত্বকারী উসমানী সাম্রাজ্য এবং ফ্যাসিবাদি সভ্যতার কেন্দ্র জার্মান সাম্রাজ্য সামরিক ময়দানে পরাজিত হওয়ার ফলে- গোটা দুনিয়ার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মাঝে বন্টিত হয়। আর ইতিহাসের নিয়মানুযায়ীই, পরাশক্তি আমেরিকা নিজ স্যাটেলাইট রাষ্ট্রগুলোতে লিবারেলিজম এবং অপর পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়া নিজ অক্ষভুক্ত দেশগুলোতে কমিউনিজমের বিষ ছড়িয়ে দেয়।

আল্লাহর ইচ্ছায় আদর্শিক দৃঢ়তা, প্রতিরোধ ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহওয়ালা ঈমানদাররা দুই পরাশক্তির খেলনায় পরিণত হওয়া ভারসাম্যহীন দুনিয়াকে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাস্তবতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। ফলে স্থানীয়ভাবে ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের পথ অনেকটাই সুগম হয়। কেননা, নিজ ভূমি থেকে দূরের দেশগুলোতে স্থানীয় দালালদের টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা পরাশক্তিগুলোর আর নেই। আল্লাহর ইচ্ছায়, আমেরিকা ও রাশিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্য নিঃশেষ হয়ে গেছে। দ্বি-এককেন্দ্রিকতা ও এককেন্দ্রিকতার পর বিশ্ব রাজনীতি আবার বহুকেন্দ্রিক অবস্থায় ফিরে গেছে।

তবে, সফল ইসলামী আন্দোলনের জন্য শীতল যুদ্ধকালীন দুনিয়ার বাস্তবতা এবং পরাশক্তির কর্মপদ্ধতি জানা আমাদের জন্য আবশ্যক। ওই সময়কার পরাশক্তিদের উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত জানা গেলে বর্তমান আমেরিকা, চীন, রাশিয়া বা ভারতের মতো তুলনামূলক দুর্বল শক্তির ভয় অনেকটাই কেটে যাবে। আর স্থানীয়ভাবে সঠিক রাজনৈতিক লাইনকে আঁকড়ে ধরে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে সেক্যুলার শাসনের কুফর ও জুলুম থেকে ইসলামী শাসনের ইনসাফ ও আদলে ফিরিয়ে আনা

যাবে!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থার বাহ্যিক রূপ হলো জাতিসংঘ। এর ভেতরের আসল রূপটি হলো দুই পরাশক্তির অধীনে দুটি মেরু। এ দুই পরাশক্তি ছিল আমেরিকা-USA, সোভিয়েত রাশিয়া (USSR)। আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার নিজ নিজ মিত্র রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত জোট নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই দুই মেরু। যেভাবে গ্রহকে কেন্দ্র করে উপগ্রহ আবর্তন করে, তেমনিভাবে এই দুই পরাশক্তিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো বিভিন্ন দুর্বল রাষ্ট্রগুলো।

পরাশক্তির আনুগত্যের বিনিময়ে গোলাম রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা পেত। তবে এই সাহায্য ছিল খুবই সীমিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো যেত কিছু নির্দিষ্ট মানুষের পকেটে। ক্ষমতাসীন প্রভাবশালী নেতা কিংবা শক্তিশালী সামরিক কমান্ডাররা এগুলো ভোগ করত। কিছুদিন এই অবস্থা চলল।

তারপর কিছু কিছু সরকারের পতন ঘটল। তাদের জায়গায় আসলো নতুন সরকার। এ উত্থান-পতনের ব্যাপারটা ঘটত এভাবে—ওই সরকার যে পরাশক্তির বলয়ে ছিল, সেই পরাশক্তি তার সমর্থন সরিয়ে নিল। কিংবা পরাশক্তির ইচ্ছা থাকলেও উক্ত সরকারের পতন ঠেকাতে পারল না। অথবা অপর পরাশক্তি সরকার-বিরোধী কোনো দলকে ক্ষমতাসীনদের মাঝে অনুপ্রবেশ করিয়ে বা অন্য কোনোভাবে (বিশ্বজগতের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে) সরকারের পতন ঘটিয়ে তার জায়গা দখল করতে সাহায্য করল।

যেসব শাসকগোষ্ঠী স্থিতিশীল হতে পারল, তারা নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধকে সমাজের উপর চাপিয়ে দিল। ক্ষমতাসীন সরকার যে পরাশক্তির বলয়ে অবস্থান নিল, সেই পরাশক্তির চিন্তা-চেতনার সাথে নিজেদেরটাকে মিশিয়ে এক মিশ্রিত মূল্যবোধ সমাজের উপর চাপিয়ে দিল। এই সব মূল্যবোধ যতোই অযৌক্তিক কিংবা সুস্থ বিচারবুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক হোক না কেন, ক্ষমতাসীনরা এগুলোকে উপস্থাপন করলো মহিমান্বিত হিসাবে। এই সরকারগুলো তাদের শাসনাধীন সমাজের প্রচলিত ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের বিরোধিতা করতে শুরু করল। কালের পরিক্রমায় তারা রাষ্ট্রের সম্পদ লুটপাট করে নষ্ট করে দিল। ফলে মানুষের মাঝে অন্যায়-অবিচার-অপরাধ বেড়ে গেল।

৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশে গঠনের মধ্যে এই পুরো কাঠামোর বাস্তবতা দেখা যায়। ওই সময় পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ছিল আমেরিকার বলয়ে। অন্যদিকে ভারত ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার বলয়ে। এদেশের বিভিন্ন নেতাকে ভারত তখন সমর্থন দিয়েছিল। এতে ছিল সোভিয়েতের প্রত্যক্ষ মদদ।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি নির্ধারন করা হয়, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, এবং গণতন্ত্র। যদিও এই দর্শনগুলোর সাথে বাংলার আমজনতার কোন পরিচয় ছিল না, সমর্থনও ছিল না। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হানাদার বাহিনীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জান-মাল-সম্মান বাঁচাতে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু তৎকালীন সেক্যুলার এলিটরা এই সংবিধানকে বাংলার মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়।

একইভাবে পরাশক্তির সাথে নিজেদের চিন্তাচেতনা মিশিয়ে এক মিশ্রিত মূল্যবোধকে 'হাজার বছরে চেতনা' নামে চাপিয়ে দেয়। আদতে তা ছিল শিরক-প্রভাবিত এবং কট্টরভাবে ইসলামবিরোধী।

এই দুই পরাশক্তি বিশ্বব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতো তাদের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার মাধ্যমে। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা বলতে বোঝানো হচ্ছে প্রবল সামরিক শক্তি। যা পরাশক্তির কেন্দ্র থেকে শুরু করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করা দেশগুলোর ভূখন্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। আত্মসমর্পণ করা ভূখন্ডগুলো হলো ঐসব অঞ্চল, যারা পরাশক্তির কেন্দ্রের প্রতি অনুগত। তার সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা মেনে নিতে বাধ্য এবং তার স্বার্থরক্ষায় দায়বদ্ধ।

এই দুই পরাশক্তিকে আল্লাহ তাআলা যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তা সুবিশাল। তবে বিশুদ্ধ মানবিক বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, এই পরাশক্তিগুলো যতোই শক্তিশালী হোক না কেন, কেবল নিজস্ব শক্তি দিয়ে, নিজ রাষ্ট্রে বসে (অর্থাৎ ক্ষমতার কেন্দ্রে বসে) দূরবর্তী কোন অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তা টিকিয়ে রাখতে তারা সক্ষম ছিল না। যেমন, মিশর কিংবা ইয়েমেনের কথা বলা যায়। এইসব দেশের শাসকগোষ্ঠী যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে নিজেদের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখা আমেরিকা কিংবা রাশিয়ার পক্ষে এককভাবে সম্ভব ছিল না।

পরাশক্তিগুলো ছিল বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল মুসলিম বিশ্বের ওপর চেপে বসা শাসকগোষ্ঠীর আঞ্চলিক শক্তি। যারা পরাশক্তির প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছিল। এসবই সত্য। কিন্তু তবু এই শক্তি একটি ভূখণ্ডকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রনের জন্য যথেষ্ট না। এ কারণে পরাশক্তিগুলো মিডিয়ার মাধ্যমে এক প্রতারণাপূর্ণ মায়াজাল তৈরি করে। মিডিয়া পরাশক্তির ক্ষমতাকে উপস্থাপন করে অপ্রতিরোধ্য এবং সর্বব্যাপী হিসাবে। এমন শক্তি, যা কিনা আসমান-জমিনের উপর কর্তৃত্ব রাখে, যেন সৃষ্টিকর্তার

ক্ষমতার মতোই তাদের ক্ষমতা!

মিডিয়ার মায়াজাল বিশ্ববাসীকে বোঝায়—পরাশক্তিগুলো অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী। তাই মানুষ যেন স্বেচ্ছায় তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। যেন তাদেরকে ভালোও বাসে। কারণ তারা স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, সমতা ও মানবতার স্লোগান নিয়ে হাজির হয়েছে।

মজার ব্যাপার হলো, নিজেদের সৃষ্ট এইসব প্রপাগান্ডাকে পরাশক্তিরাও বিশ্বাস করে বসেছিল। তারা ভাবতে শুরু করেছিল সত্যিই বুঝি তারা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তারা বিশ্বের কোনো স্থানকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম! কোনো রাষ্ট্র যখন এই কাল্পনিক শক্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে, এবং সেই মোতাবেক আচরণ করতে থাকে, তখন তার পতনের পালা শুরু হয়। পরাশক্তিগুলোর ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটাই ঘটেছে। তারা তাদের মিডিয়ার প্রচারণাকে নিজেরাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। নিজেদের বানানো মায়াজালে নিজেরাই জড়িয়ে গেছে।

আমেরিকান লেখক পল কেনেডি ঠিক যেমনটি বলেছেন,

‘আমেরিকা যদি তার সামরিক শক্তির ব্যবহারে অতি প্রসারতা আনে এবং কৌশলগতভাবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে, তবে এটাই তার পতন ডেকে আনবে।”

পরাশক্তিগুলোর বিপুল সামরিক শক্তির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে তাদের নিজ ভূখন্ডের সামাজিক সংহতি। (সমাজের বিভিন্ন অংশ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেকার সংহতি ও সমন্বয়।) এই সংহতি ও সমন্বয় ছাড়া বিপুল পরিমাণ সামরিক শক্তি আর তথ্য-প্রযুক্তির কোনো মূল্য নেই। যদি সমাজের সংহতি ভেঙ্গে পড়ে, সামাজিক সত্তা ধ্বসে যায়, তাহলে এই বিপুল সামরিক শক্তিই পরাশক্তির জন্য পরিণত হতে পারে অভিশাপে।

যেসব উপাদান সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক সত্তার পতন ডেকে আনতে পারে সেগুলোকে ‘সভ্যতা-বিনাশী’ বলা যায়। ধর্মীয় অবক্ষয়, নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক বৈষম্য, বিত্ত-বৈভব, আত্মকেন্দ্রিকতা, পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দকে প্রাধান্য দেয়া, সব কিছুর উপর দুনিয়াকে ভালোবাসা ইত্যাদি, ‘সভ্যতা বিনাশী উপাদান।

যখন কোন পরাশক্তির ভেতরে অনেকগুলো সভ্যতাবিনাশী উপাদান একসাথে দেখা দেয়, এবং একে অপরের সাথে মিলে পরস্পরকে শক্তিশালী করে, তখন ওই পরাশক্তির পতনের গতিও বেড়ে যায়। এই উপাদানগুলো সমাজে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকতে পারে, কিংবা সুপ্তও থাকতে পারে। তবে উপাদানগুলো পুরোপুরি ক্রিয়াশীল হয়ে পরাশক্তির কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার পতন ঘটানোর পর্যায়ে পৌঁছাতে আরেকটি সাহায্যকারী উপাদানের প্রয়োজন।

যখন সব উপাদানের উপস্থিতি থাকে, তখন পরাশক্তি ও তার কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পতন ঘটে। সামরিকভাবে সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন। কেননা সামরিক ক্ষমতা ও মিডিয়ার মাধ্যমে অর্জিত কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা শুধু তখনই কার্যকর হতে পারে, যখন কেন্দ্রে সামাজিক সংহতি ও একতা বজায় থাকে।

শক্তি বা ক্ষমতার দুটি ধরণ দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে, শাসনব্যবস্থা পুনরুদ্ধার হয় দুইভাবে।

- সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে, অথবা
- (আকিদাহ কিংবা সত্যের ভিত্তিতে না হয়ে) কেবল জুলুম প্রতিহত করে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে। কারণ যুলুম প্রতিরোধ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা মুমিন-কাফের সবার কাছেই সমাদৃত বিষয়।

এবং আল্লাহর ইচ্ছায় শরিয়াহ ও সার্বজনীন মূলনীতির আলোকে, পরাশক্তির সামাজিক সংহতি ও মিডিয়ার মায়াজাল ছিন্ন করে এবং ঈমান, বিপ্লব ও আত্মত্যাগের মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করে, অগ্রগামী ও আত্মত্যাগী ঈমানদাররাই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা দুই অতিদানবের পতন ঘটিয়েছিলেন মাত্র ৩ যুগের ব্যাবধানে!

(আলোচনাটির মূল অংশ "ইদারাতুত তাওয়াহহুশ" বই থেকে গৃহীত)